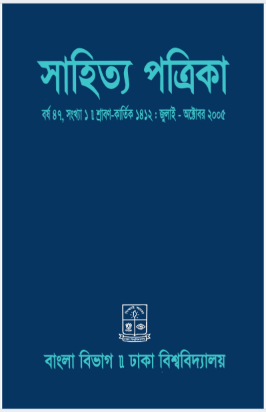

Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শামসুর রাহমানের কবিতা : চতুরাঙ্গিক জীবন-ভাবনা

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.3
Pages	49-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শামসুর রাহমানের কবিতা : চতুরাঙ্গিক জীবন-ভাবনা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

শামসুর রাহমান সে সমস্ত কবির একজন যিনি কবিতার সঙ্গে 'লত্‌কা লত্‌কি করে'[১] দেখে ফেলেছেন জীবনের অপার রহস্য। অনুধ্যানে, রোমন্থনে এবং সংবেদনায় তাঁর একাত্মতা বিস্ময়কর। তিনি কবিতা লেখেন জীবনের পৃষ্ঠার পরে দাঁড়িয়ে। হয়তো সেটি 'খুকির' ফুল্কি-তোলা রুমালের মত অথবা 'টিনের বাক্সে' রক্ষিত লাল ফিতে ও ক্ষুদ্র পুঁটুলির মধ্যে নিভৃত শৈশব। তাঁর শিশিরগুলো মোলায়েম আবেগে শীত-মাখা। তাঁকে নির্বিকার স্মৃতিবাহী বর্ণনাময় আত্মগত মানুষ মনে হয় কখনো। কখনো বা তিনি করতালি মুখরিত সার্কাসের নিচে নিরানন্দ জীবনের রহস্য-উন্মোচনকারী। বাস্তবিক, রাহমানের জীবন তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার বৈচিত্র্যের স্মারক, প্রান্তময় পথের চিহ্নায়ক। এ রচনায় তাঁর কবিতায় বিধৃত জীবন-চেতনার স্বরূপ আলোচনা করা হল।

শামসুর রাহমানের কবিতায় বিধৃত জীবন চারটি স্তরে নির্ণিত হতে পারে। প্রথমত কবির শৈশব ও নাগরিক জীবনের রূপায়ণে মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবন ; দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন উঠে এসেছে, নাগরিক অভিযোজিত মানুষের দূরতম নস্টালজিক চেতনায় দিনাতিপাত ও ভাসমান মানুষের বৈপরীত্যায়ন, তৃতীয় পর্যায়ের জীবনচিত্র পাওয়া যায় কবির অধীত বিদ্যার আন্তর্সংশ্লেষণে পুরাণ-প্রতীতীজাত জীবন এবং শেষ পর্যায়ে সংগ্রামকর্ষিত মানুষের প্রতিবাদ, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনাবলির প্রতীকায়িত জীবন। আসলে শামসুর রাহমান চল্লিশের দশকের পুরনো ঢাকার জীবনকে টেনে নিয়ে এসেছেন আধুনিক আজকের রাজধানী ঢাকার ঘূর্ণিত জীবনে। সেখানে রাহমানের বেতো ঘোড়া নেই বটে , নেই সহিসের হিস হিস শব্দ কিংবা আস্তাবলে খড়ের গম্বুজে ঘুমানো অবেলার জোব্বাঅলা একজন।[২] তাঁর ধ্যানী চোখ একটি অর্দ্ধ শতাব্দীর কাব্যচর্চার অভিজ্ঞতায় স্থির মীমাংসায় পৌছায়।

১. *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)* কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই শামসুর রাহমান কবিতার সঙ্গীতে সুর তোলেন। জীবনানন্দ-অভিনিবেশ এ পর্যায়ে তাঁকে আলোড়িত করলেও মুখ্যত তিনি এ গ্রন্থেই কবিতার 'রূপালি স্নান'টি সেরে ফেলেন[৩]। যদিও 'সন্ধ্যা-নদীর আঁকাবাঁকা জলে মেঠোচাঁদ লিখে রেখে যায় কোন গভীর পাঁচালি'—

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দীয় আবহকে মনে ধরায় তবু শামসুর রাহমান শান্ত রূপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নানরত থাকেন। আর দেখেন নিম্ন-মধ্যবিত্তীয় প্রাত্যহিক শাহরিক জীবনের একজনকে—

শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়।
শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে,
দেয়ালে আলোর পরী। খোলা দরজা।[৪]

বোঝা যায় রাজধানী ঢাকার প্রাক-নগরায়ন পর্ব এটি। পঞ্চাশের মেদুর, শান্ত, স্থবির সময়ের জীবনচিত্র। একঘেঁয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রাত্যহিক জীবন। ঘোড়া এবং সহিসের হিস হিস শব্দ মাঝে মাঝে সেই নাগরিক জীবনকে চঞ্চলতা দিলেও আস্তাবলের সহিসের অবসন্ন নিদ্রাটিও সেই জীবনেরই উৎসারিত প্রতিস্বর।

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেক্ষণ থেকে ঝিমুচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো।[৫]

এই আফিমখোরের মতো ঝিমন্ত বেতো ঘোড়ার ঝিমুনির পাশাপাশি তার মনিব সহিসের অবস্থাটিও লক্ষযোগ্য—

হলদে খড়ের শয্যায় বুড়ো সহিস ঘুমিয়ে আছে সেখানে
ক্লান্ত দেহে, নিঃসন্তান, বিপত্নীক —নিদ্রিত
কাঠের নক্সা যেন অবিকল।[৬]
(সেই ঘোড়াটি)

আসলে নিঃসন্তান, সঙ্গীহীন কাঠতুল্য একটি সময়ের জীবনকেই শামসুর রাহমান তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় তুলে এনেছেন। কবি যেন সেসবের সরল বর্ণনাকারী একজন। দেখছেন আর লিখে রাখছেন। এরি মধ্যে তাঁর বেড়ে-ওঠার পর্বটিকেও তিনি চিহ্নিত করেন। পুরনো ঢাকার বর্ণনায় যেমনই তিনি স্মৃতিমেদুর, তেমনি দুঃখাশ্রয়ী—

খুকীর পুতুল রানী এবং খোকার পোষমানা
পাখিটার ডানা
মুখ-বুঁজে থাকা
সহধর্মিনীর শাদা শাড়ির আঁচলে দুঃখ তার
ওড়ায় পতাকা।[৭]

আবার কখনো এই দুঃখবোধ তাঁর আত্মজীবনীর ঢঙে শৈশব বর্ণনায় প্রকাশিত হয়—

মা'কে দেখি। আজো দেখি কী এক মায়ায়
পাখি তার হাতে থেকে স্নেহের খাবার খেয়ে যায়

দুবেলা আবেগ ভরে। দেখি তসবি গুণে
সন্ধ্যার মিনারে[৮]

এই পর্বে শামসুর রাহমান যে জীবন-দ্রষ্টা সেটিকে তিনি রোমান্টিক অনুষঙ্গে প্রকাশ করেন। কোথাকার কোন বাঁশিঅলা অথবা, সহিসের ধারে-কাছের মাতাল তাড়িসেবক, টিনের বাক্সে খুকুর পুতুল রানী, পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ সেসবের বর্ণনায় তিনি অবিরল কথক—

রৌদ্রের দস্যুতা জেনে বৃষ্টির আঁচড়ে
মুহ্যমান দুঃখের দর্পণে দেখে মুখ
বাসি রুটি
চিবোয় অভ্যাস বশে জ্যোৎস্না-জ্বলা দাঁতে[৯]

এই প্রাত্যহিক চিত্রের সঙ্গে অভিযোজিত হয় আরব্য রজনীর কিছুটা আমেজও। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষযোগ্য —

একতাল শূন্যতায় ভাবে
বেহেস্তের হুরি যায় কশাই চামার
ছুতোর কামার আর
মুটে-মজুরের ঘরে আর দরবেশের গুহায়
বাদশার হারেমে সুন্দরী বাঁদি যদি
বিলাসের কামনার খাদ্য হয়[১০]

শামসুর রাহমানের কবিতার জীবনচিত্রের এই সূত্রানুসন্ধানে তাঁর মানসগঠনের কাল-পরিক্রমার একটি চৌম্বক পর্যালোচনা আবশ্যক। কারণ বাংলাদেশের কবিতার চল্লিশের প্রথম আয়োজনটির অব্যবহিত পরের পঞ্চাশের দশকের প্রস্তুতির বিষয়টিও এ চেতনার মধ্যে বিধৃত।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার প্রধান উদ্দিষ্ট হয়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র-কাঠামোর সঙ্গে শিল্পিসত্তার এক বিরলতম অভিজোজন-স্পৃহা, যেটি এ নতুন ভূখণ্ডের জন্য হবে আলাদা বৈশিষ্ট্যসূচক। বস্তুত চল্লিশের কবিরা এ বোধ থেকেই কাব্যরচনা শুরু করেন। আর এ বোধ বাঙালি মুসলমানের জন্য নতুন প্রেরণার সূচনা করে। কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে বিভাজিত রাষ্ট্র-কাঠামোয় বাঙালি মুসলমানের পুনরুত্থান সম্ভবপর হবে (যেটির সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে ভারত বিভক্তির পূর্বকালে)—এ বোধ অনেকের মধ্যেই ছিল ক্রিয়াশীল। কারণ বিগত শতাব্দীতে যে সাহিত্য-কাব্যকলার সৃষ্টি হয় তার প্রধান রূপকার ছিলেন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু অচিরেই এর মোহমুক্তি ঘটে। কারণ পাকিস্তান-শাসিত পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ প্রথমেই অনুভব করল তার অস্তিত্বের সঙ্কট। আর এর প্রথম অভিঘাত অনুভূত হয় ভাষা-সম্পর্কিত চেতনায়। বাঙালি অনুধাবন করল আত্মত্যাগের আবশ্যকতা — যার

অনিবার্য পরিণাম ছিল বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন। অতঃপর ৫৪-এর নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের গঠন, আইয়ুবী কালোদশকের সূত্রপাত(১৯৫৮) ইত্যাদি ঘটনাবলির তরঙ্গক্ষুব্ধ অভিঘাত বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে সৃষ্টি করল প্রবল সংশয়, দ্বিধা ও যুগপৎ সংগ্রামীবোধের। এ পরিস্থিতির আলোড়ন চলেছিল সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও। পাকিস্তান-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশ যাঁরা সামন্ত মানসিকতা পোষণ করতেন তাঁরা পূর্বতন মনোভাবকেই সাহিত্যে নবতর উদ্যোগে রূপায়ণের চেষ্টা চালালেন। সুতরাং তাঁরা চাইলেন বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন ধারাকে বাদ দিয়ে ইসলামি চেতনা ও পুঁথি সাহিত্যের আদলে জীবনাদর্শের রূপায়ণ। সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ প্রমুখ এ ধারায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তান-পরবর্তী আবির্ভূত কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ-শ্রেণীর মনোভাবের দেখা গেল চরম অসঙ্গতি। তাঁরা মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল চেতনায় শিল্পসাহিত্যকে প্রধাবিত করার চেষ্টা করলেন। আর ইউরোপীয় মানবতা ও নন্দনতত্ত্বে স্থিতধী হলেন। সুতরাং সাহিত্যাঙ্গানেও সৃষ্টি হল মতদ্বৈধতা। অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেই বাংলাদেশের কবিতা পাকিস্তানি বা ইসলামি ভাবধারা এবং মানবতাবাদী ধারা, চেতনাগতভাবে এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর শামসুর রাহমান শেষোক্ত ধারারই একজন স্বনিষ্ঠ কাব্যসাধক।

২. আবাল্য নাগরিক কবি শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় নগরকেই আরাধ্য করে তুললেন। এর 'কারণ প্রধানত ত্রিবিধ : প্রথমত বস্তু পৃথিবীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, কেননা তিনি ছিলেন সেই শহরেরই আবাল্য অধিবাসী; দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের কবিতা এতে হয়ে উঠেছিল মূল তিরিশের নাগরিক কবিতা কিংবা বিশ্বকবিতার সমীপবর্তী এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশের কবিতার শরীর থেকে তিনি ঝরিয়ে দিতে চাইছিলেন অনাধুনিক গ্রামীণতার অপবাদ।[১১] আর কাব্যবোধে তিরিশোত্তর কবিদের মতো ইঙ্গ-মার্কিন চেতনায় পরিস্নাত হয়েও, বোদলেয়ার-নিবিষ্ট পাঠক হওয়া সত্ত্বেও শামসুর রাহমান মূলত দেশজ জীবন-সংশ্লেষী কবি। কেননা 'শামসুর রাহমান বুঝেছিলেন আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু আত্ম-আবেগের সঙ্গে পরিপার্শ্বের কোনো মিল খুঁজে পান না তিনি। কেননা নাগরিকতা বা পাশ্চাত্যের আধুনিকতাবাদের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত ছিল না বাংলাদেশে।[১২] আর এ জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে রাহমান কবিতায় রূপায়িত করেন তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবন-সংশ্লেষী চেতনার। যা তাঁর নাগরিক অভিযোজিত মানুষের দূরতম নস্টালজিক চেতনায় দিনাতিপাত ও ভাসমান মানুষের বৈপরীত্যায়নে সৃষ্ট এক ধরনের আত্ম-বর্ণনা। তবে এর সঙ্গে আছে স্মৃতিময়তা, পারিপার্শ্বিকের মেদুর বর্ণনচিত্র ও বৈপরীত্যায়ন। 'খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি'[১৩] কবিতায় নাগরিক মানুষের পরিপাটি রোমান্টিক বর্ণনায় সমান্তরাল ভাসমান জীবনের এক প্রতিসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. বড়ো রাস্তা, ঘুপচি গলি ঘিঞ্জি বস্তি, ভদ্রপাড়া আর
ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে,
দাঁড়ালাম। কাচের আড়ালে দেখি কাঠের পুতুল,
রেলগাড়ি, ছক-কাটা, বাড়ি, আরবী ঘোড়া এক জোড়া,
উড়ন্ত পাখির মতো এরোপ্লেন, টিনের সেপাই।
ভালুক বাজায় ব্যান্ড, বাঁকা-শিং হরিণের পাশে
বাঘের অঙ্গার জ্বলে, বিকট হা করে আছে সিংহ ঃ
সারি সারি রয়েছে সাজানো ওহো হরেকরকম
বাজনা বাঁশি বাদশা বেগম আর উজির নাজির।
আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই
উজিরের মতো, নাগরা নেই পায়।

২. ডেপুটি হাকিম নই, নই কোনো ভবঘুরে কবি;
পথের গোলাম আমি, বুঝেছো হে, অলীক হুকুমে
চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুই। ঠ্যাং দুটি একতারা
হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে
বাউলের কথামৃত স্বপ্ন হয় আমের বাউল।

৩. যে লোকটা সারাদিন পাখি বেচে গড়েছে সংসার,
হলুদ পাখির মতো যার বউ সে কেন গলায়
পরে ফাঁস?

উপর্যুক্ত ১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে নাগরিক ফানুস-সর্বস্ব বাস্তবতার বিপরীতে ভাসমান প্রাকৃত মানুষের জীবনচিত্রের ব্যঞ্জনাত্মক প্রকাশ ঘটেছে। খেলনার দোকানের আপাতনগর পরিচ্ছন্নতা এবং কৃত্রিমতায় যে জীবন চিত্রিত সেটি অবক্ষয়িত সামন্ত জীবনের শেষ বর্ণচ্ছটা। কাচের আড়ালে কাঠের পুতুল, রেলগাড়ি, আরবি ঘোড়া, টিনের সেপাই, বাদশা বেগম, উজির নাজির প্রভৃতি অনুষঙ্গ আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের কথা স্মরণ করায় যার রেশ ধরে পঞ্চাশের নাগরিকতার মঞ্চায়নের যাত্রা শুরু। আর তাই নাগরিক জীবনের ভাসমান মানুষের সঙ্গে এ ঐতিহ্যের উপাদান অনুপস্থিতির বিবরণ প্রকটিত 'আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই উজিরের মতো, নাগরা নেই পায়' এরকম বাক্যবন্ধে। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে এ-ভাসমান ভিখিরির মনোবেদনা আত্ম-মীমাংসায় পৌঁছায় একধরনের শিল্পবোধে। কারণ স্বাপ্নিকতা ও চলমানতায় তার জীবন অর্থবহ মনে হয় তখন, যখন সে বলে—'ঠ্যাং দুটি একতারা হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে/ বাউলের কথামৃতে স্বপ্নে হয় আমের বাউল।' কিন্তু এ নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণ-কাঠামোও একই কবিতায় উঠে আসে ভিখিরির

মনোকথনে—'দেশকে নতুন করে গড়ে পিটে নিতে/ চেয়েছে হুজ্জত সব জ্বলন্ত জোয়ান।'[১৪] শেষ দৃষ্টান্তে পাখিঅলার জীবনচিত্রের ভয়ানক বিয়োগান্তক দিক উন্মোচিত হয়েছে এ বিপরীত-ভাষে। পাখি-বিক্রেতার আর্থসামাজিক বাস্তবতায় পাখিতুল্য তার দাম্পত্য জীবনের পরিহাস যেন চরণদুটিতে প্রতিতুলিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের অন্তরালে এই যে বিপরীত জীবনচিত্র সেই রূপটিই উঠে এসেছে শামসুর রাহমানের এ পর্বের কবিতাগুলোতে। পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ, একটি মৃত্য-বার্ষিকী, খেলনার দোকানে ভিখিরি, শনাক্ত পত্র, শৈশবের বাতিঅলা আমাকে, জনৈক সহিসের ছেলে বলেছে, পিতলের বক, কখনো আমার মাকে, দৃশ্যপট আমি এবং অনেকে, কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি প্রভৃতি কবিতায় তাঁর নাগরিক মধ্যবিত্তসুলভ অভিযোজিত মানুষের পাশাপাশি ভাসমান নগরেরই মানুষের প্রতিচিত্র বিম্বায়িত হয়েছে কবিচিত্তের রোমান্টিক স্বভাবে। এ সঙ্গেই এসেছে কবির শৈশবচেতনা, প্রত্যক্ষ নাগরিকবাস্তবতা, প্রজন্মগত দ্বন্দ্বের অভিঘাত। এ প্রবংশগত দ্বন্দ্ব শামসুর রাহমানের বহু-ব্যবহৃত কবিচৈতন্যের প্রতীক ঘোড়া ও সহিসের ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়। যেমন—

> ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
> ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
> খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
> মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুকনো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব
> বুড়োটে শরীর
> কিছুকাল ধরে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা বিছানায়।[১৫]

বোঝা যায়, পুরনো ঢাকার সহিসের জীবনচিত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রবংশগত কারণে এ-সহিস চলে যাচ্ছে জীবনের উপান্তে, তারই সন্তান ভাবছে সেই ঘোড়ার কথা যাকে তার পিতা জীবিকার অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ জীবন বদলেছে। গতস্য জীবনের সঙ্গে সূচিত হয়েছে মোটরযান ও বিকল্প যানের ব্যবস্থা এবং নাগরিক যন্ত্রশিল্প। কারণ আজ আর

> রাজা-রাজড়ার দিন নেই আর ছাপার হরফে
> কত কিছু লেখা হয়, কানে আসে। ছোটো-বড়ো সব
> এক হয়ে যাবে নাকি আগামীর সখের নাটকে।[১৬](ঐ)

ফলে সহিস পিতাকে 'গতায়ু হবেন যিনি আজ কিংবা কাল/অথবা বছর ঘুরে' তাকে বড়ো দুর্বোধ্য ঠেকে পুত্রের।—

> তাঁকেই ভাবছি যিনি ঘোড়াকে জরুর মতো ভালোবেসেছেন
> আজীবন। মুমূর্ষু পিতার চোখে তরুণ ঘোড়ার
> কেশরের মতো মেঘ জমে প্রতিক্ষণ। মাঝে-মাঝে
> তাঁকে কেন যেন
> দুর্বোধ্য গ্রন্থের মতো মনে হয়, ভাষা যার আকাশ-পাতাল

এক করলেও, মাথা খুঁড়ে মরলেও
একবর্ণ বুঝি না কখনও।[১৭] (ঐ)

সুতরাং এ জেনারেশন-বদলের বাস্তবতায় সহিসের ছেলে আর তার প্রবংশের জীবিকায় আস্থা রাখতে পারে না। কারণ তার স্বপ্নে ঘোড়া নয়, বরং নতুন জীবিকার আলোড়ন—

অথচ আমার স্বপ্নে রহস্যজনক ঘোড়া নয়,
কতিপয় চিম্‌নি, টালি, ছাদ, যন্ত্রপাতি; ফ্যাক্টরির
ধোঁয়ার আড়ালে ওড়া পায়রার ঝাঁক
এবং একটি মুখ ভেসে ওঠে, আলোময় মেঘের মতই
একটি শরীর
আমার শরীরে মেশে[১৮]

এ নাগরিক বর্ণনায় কবিচিত্তের দহনটিও পাওয়া যায়। কারণ যে নগর-মনস্ক কবিমানস, তার আছে সামাজিক দায়বোধ। তীব্র মানবিক-সংবিত্তি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয় শ্রেণী-বৈষম্যে। প্রত্যক্ষ নগর-জীবন বর্ণনায়, মধ্যবিত্তমানসের সেই অন্তর্দহন—

১. দ্রুত পথ হাঁটতে গিয়ে কতদিন একটা টক টক গন্ধে উন্মন হয়ে
দেখেছ পথের পাশে হতচ্ছাড়া কোনো দোকানে
তন্দুরের ভেতর বিস্কুটগুলো একরাশ তারার মতো
জ্বলজ্বল করছে।[১৯]

২. ঘোর বর্ষায় বাসের হাতলে ঝুলতে ঝুলতে প্রকাণ্ড প্রত্যাশায়
পাড়ি জমিয়েছিলে কোনো শ্যামল পাড়ায়। মধ্যে-মধ্যে
বনোয়ারী দিনে রাধার হাসির মতো বিদ্যুৎ উঠতো ঝলসে। 'বেওয়ারিশ
ভাবনার মালিকানা কারুর একার নয়' বলে যে লোকটা
বেঠিক স্টপেজে পৌঁছে টলতে টলতে সংক্ষিপ্ত গলির মোড়ে
বাকাট্টা ঘুড়ির মতো লাপাত্তা, তার দিকে দৃষ্টি মেলে—
ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই, ভরা বাসে সামলে থাকুন, নয়তো
পা হড়কে যাবেন পড়ে বলে যে কণ্ডাক্টার আউড়ে গেলো
কিছু অলৌকিক নাম—তার দিকে চেয়ে তুমি স্বপ্নের স্বত্বের কথা
ভাবছিলে।[২০]

উপর্যুক্ত ১-সংখ্যক দৃষ্টান্তে তন্দুরের ভিতরে অগ্নি-জ্বলজ্বলে বিস্কুট কবিআত্মার প্রতীক। ২-সংখ্যক দৃষ্টান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের বাসে ঝুলন্ত যাতায়াত যেন অনির্দেশ্য বৃত্তাবদ্ধ জীবনেরই প্রতীক-ভাষ। আর 'বেওয়ারিশ ভাবনার মালিকানা'-র উল্লেখে এক ভাসমান জীবনমানসের পরিচয় পাওয়া যায় এ শহরে যার স্থান-সংকুলনের অভাব এবং একটু অসতর্ক হওয়া মানেই জীবনপাতের সম্ভাবনা।

৩. ঐতিহ্য-সম্পৃক্ততা আধুনিক যুগ-চৈতন্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কবির কাছে এতিহ্য কখনও কেবল অতীত নয়, বরং সেটি তার অতীত ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতার রূপান্তরধর্মিতার অনিবার্য উপাদান। শামসুর রাহমান যেহেতু ইউরোপ-মনস্ক কবি তাই তাঁর ঐতিহ্যভাবনায় ক্রিয়াশীল কবির অধীত বিদ্যার অন্তর্সংশ্লেষ। আর এক্ষেত্রে তিনি যে জীবন-নির্মাণ করেন সেখানে ইকারুশ ডেডেলাস, ইলেক্ট্রারা বিচরণ করেন নতুন জীবনবোধের সঞ্চারক হিসেবে। তাঁর এ ঐতিহ্যচেতনা অবশ্যই তিরিশ-বাহিত বাংলা কবিতার সম্প্রসারণতায় নিবিষ্ট। 'শামসুর রাহমান শহুরে সামন্তলগ্ন অপুষ্ট বুর্জোয়া চৈতন্যে ধারণ করেন নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয় সত্তার চাঞ্চল্য, অথচ তিনি মিথ ব্যবহার করেন ব্যক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার অভিলাষে, ব্যক্তির নির্ভরতা নির্দেশের লক্ষ্যে, মিথ বা পুরাণপাত্রে সমগ্র জাতির, যুগসংক্রান্তির ভাষ্যরচনা তাঁর লক্ষ্য নয়। ব্যক্তিচরিত্রপাত্র-জাতীয় মিথব্যবহার অবশ্য স্বদেশ ও অভিভাবক-শক্তির প্রতি কবির ভরসা ও নিবেদনকেই প্রতীকায়িত করে, যেমন টেলেমেকাস, ইকারুসের আকাশ, ডেডেলাস, চাঁদ সদাগর, রুস্তমের স্বগতোক্তি প্রভৃতি কাব্যচরিত্র কবির স্বপ্নাতুর রোমান্টিক মনের ও আত্মকীয়তার প্রতীক-চিহ্নিত।'[২১]

ইকারুসের আকাশ (১৯৮২) শামসুর রাহমানের পুরাণ-মনস্কতার উৎকৃষ্ট সংযোজন। মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আত্ম-চৈতন্যের উন্মীলনে আমরা রাহমানকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য পুরাণ-মগ্ন হতে দেখি আর সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য যাতায়াত। এর উৎস তাঁর অধীত বিদ্যার অন্তর্জলি-রূপ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়ে গেছে। যে স্বপ্ন আর চেতনায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় তার চেতনা প্রায় তিরোহিত। নতুন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আগামেমননের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। 'নিহত জনক, আগামেমনন, কবরে শায়িত আজ'। আর সে-কারণে স্বপ্ন আছে। আছে ইলেক্ট্রার ঐকান্তিক প্রতিশোধ-স্পৃহা স্বপ্নপুরাণের গান। কিন্তু সময় প্রতিকূল। প্রয়োজন আজ ওরেস্টেসের। তাই ইলেক্ট্রা আত্মগত গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে বাংলাদেশের জনকের মৃত্যুর প্রতিশোধ-স্পৃহা। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধে-অপারগ ইলেক্ট্রা আত্মবিলাপে পিতার শোককে ধারণ করে আছে। কারণ এজেস্থাসের শাসনামলে পিতার জন্য প্রকাশ্যে শোক করাও অপরাধ।

> আড়ালে বিলাপ করি এক একা, ক্ষতার্ত পিতা
> তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ[২২]

অথচ আগামেমননরূপী জনকের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন, স্বাধীনতার বিজয়-কেতন যেন ট্রয়ের বীরত্বগাথা—

> সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
> বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
> শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
> পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।[২৩]

শামসুর রাহমানের এ পুরাণ-প্রতীতীজাত জীবন আসলে একটি অবরুদ্ধ, নির্বাক, অশুভ শক্তির শাসনামলে ক্রান্তিকালের বাংলাদেশের মানুষের বাকরুদ্ধ উচ্চারণ।আর তাই তিনি গেছেন ঐতিহ্য-গাথায়, অধীত বিদ্যার পরিমণ্ডলে। 'ইকারুশের আকাশ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কবির স্বাপ্নিক উচ্চারণের সঙ্গোপন আকুতি। ইকারুসরূপী কবিচৈতন্য আসলে শিল্পের স্বাধীন আকাশে সদম্ভে উড্ডয়নকামী। সেখানে মৃত্যুভয় তিরোহিত বরং পরাধীন চৈতন্য থেকে আত্মমুক্তি-প্রয়াসী। কারণ পিতার নিষেধের তর্জনীর মধ্যেই ছিল ইকারুসের পরিণাম। তথাপি সে জীবন মধুময়, প্রাপ্তিময় হলেও আত্মত্যাগেই বাঁচার সার্থকতা নিহিত। কারণ –

কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের সঠিক পরিণতি। পালকের ভাঁজে ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার।[২৪]

রাহমানের পুরাণ-অন্বেষা এভাবেই তাঁর কবিতায় রূপায়িত হয় ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক চৈতন্যে। কখনো বা লোকপুরাণের ব্যবহারও তাঁর কবিতায় সমকালীন বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় যদিও তা খুবই অপ্রতুল। 'চাঁদ সদাগর' কবিতাটি এমনি একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। এখানে কবির চম্পক নগর হয়ে ওঠে সমকালীন বাংলাদেশেরই নামান্তর। আর কবিচিত্ত আদর্শস্নাত, অমিত পুরুষকারের তেজস্বিতায় অনমনীয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক তরুণ চাঁদ সদাগরের রূপ পরিগ্রহ করে—

যতদিন হিন্তাল কাঠের
লাঠি আছে হাতে, আছে
ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে
আমার মুহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে
নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,
করবো না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,
যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
গাঙুরের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।[২৫]

তবে শামসুর রাহমানের এ পুরাণ-পর্বটি সাময়িক। কবিচেতনার অন্তর্গূঢ় গুল্মপ্রদেশের অবদমিত বাকনির্মাণের প্রচেষ্টায় তাঁর এ পুরাণ অভিগমন। এ ছাড়া পঞ্চাশের আরো অনেক কবির মতই তিনি দ্রুত অনুপ্রবেশ করেন সামাজিক দায়বদ্ধ জীবনচেতনার প্রত্যক্ষ-উত্তাপময় কাব্যভুবনে। এ কথাও ঠিক তাঁর আন্তর্বিদ্যক বৈশিষ্ট্যে

নির্মিত এ সংক্ষিপ্ত জীবন অন্বেষার পর্বটিও তাঁকে করেছে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

৪. শামসুর রাহমান মূলত সে কবিদের একজন যিনি বাংলাদেশের কবিতায় বুর্জোয়া মানবিকতার সূত্রে দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পূর্ববাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল ভাষাআন্দোলন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের কবিতার গতিপথ সুবিন্যস্ত ও বৈশিষ্ট্যসূচক করতে কবিদের ভূমিকার কথাও শুরুতে বলা হয়েছে। শামসুর রাহমানের কবিতা প্রথম থেকেই হয়ে পড়ে মানবিক দায়বদ্ধতার কবিতা হিসেবে। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* থেকে *নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮)* পর্যন্ত শামসুর রাহমানের কবিতার উত্তরণ অনেকটা নাগরিক স্মৃতি ও নির্বিকার বর্ণনারীতিতে বিন্যস্ত। তাঁর কবিতার মর্মমূল *'নিজবাসভূমে'* (১৯৬৮) পর্বে এসেই যুক্ত হয়ে পড়ে সামষ্টিক পরিব্যাপ্তিতে। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় সমকালীন রাষ্ট্র-কাঠামোর নানা ঘটনাবহ আলোড়ন-আন্দোলন। এবং এ নতুন জীবন-ঘনিষ্ঠ চেতনা শামসুর রাহমানের কবিতায় নব্বইয়ের সূচনালগ্ন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বৈরাচারবিরোধী নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত। এ-কারণেই বর্তমান আলোচনায় কবির এ-পর্বের জীবনচেতনা আহৃত হয়েছে— সংগ্রামকর্ষিত মানুষের প্রতিবাদ অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীর প্রতীকায়িত জীবন হিসেবে। তবে এ জীবনচেতনায় অনুপ্রবেশ শামসুর রাহমানের কবিতায় আকস্মিক নয়। এর উৎস সন্ধানে তাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা আবশ্যক।

সাতচল্লিশোত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনের মতো পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও শুরু হয়েছিল গভীর ষড়যন্ত্র। এবং এর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি এবং এককভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতায়, এ কথা পূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। ভাষা-সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বাংলা ভাষা নিয়েও সামরিক সরকার এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে আইয়ুবী শাসনের আরেকটা প্রচেষ্টা। 'একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি মজবুত করার জন্য সামরিক সরকার প্রথম থেকে চেষ্টা চালায়। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি ভাষা তৈরি করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে, সাংবাদিক সম্মেলনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় আইউব খান সে-বিষয়ে ইঙ্গিত দেন।"[২৬] বাংলা একাডেমী সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে গঠন করে ভাষা-সংস্কার কমিটি। কমিটি বাংলা বর্ণমালা থেকে কতিপয় বর্ণ বর্জন করাসহ কিছু সুপারিশ করে। কিন্তু সরকারের এ-প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অনেকের চোখে এটি বাঙালি জাতিসত্তার ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে পরগণিত হল।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদযাপন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে দ্বিধা-সংশয় এবং সন্দেহের জন্ম দিল। রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডিত করে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছড়ানোর অভিপ্রায়ে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানবাদের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করল। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুল ইসলাম অধিক গ্রহণযোগ্য হলেন। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে এ বিতর্কের সূত্রপাত দেখা দিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত ইসলাম-পন্থী একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে। দৈনিক আজাদ ১লা বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করে: 'সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ অনুসারী ও ভক্ত। তাহাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তাহারা এই সুযোগে তামুদ্দীনক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে"[২৭] কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ ও অগণিত রবীন্দ্রভক্তের উৎসাহে মফস্বলের বহু জায়গায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদযাপিত হতে থাকে। ঢাকায়ও কোথাও কোথাও বেশ জোরে-শোরে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে জনৈক মন্ত্রীর রবীন্দ্র-বিরোধী মন্তব্যে আবারো রবীন্দ্র বিতর্কের শুরু হয়। "১৯৬৭ সালের জুন মাসে পিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের সময় পূর্ববাংলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নিয়ে পরিষদের ভেতরে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এক উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা চলে। ক্রমে-ক্রমে সেটা পরিষদের বাইরে বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রসারিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশ্নে গুরুতর বিতর্কের সূচনা করে।"[২৮] এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও সচেতন জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ায় গঠিত হয় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ"(১৯৬৭) । সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সরকার রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য থেকে সরে আসে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এ সাফল্য এ দেশের মুক্ত চিন্তার মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে এনে দেয় নতুন প্রাণাবেগ। পরবর্তীকালে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামেরও উজ্জীবনী প্রাণশক্তির প্রতীক। মূলত শামসুর রাহমানের কবিতায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সামালোচকের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়—'জাতীয় জীবনও এই সময় থেকে নানা ঘটনায় হয়ে উঠছিল উন্মুখর। হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্র-বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। শামসুর রাহমানের বিশেষত্ব হচ্ছে এইসব ঘটনাকে কবিতা করে তুলতে পেরেছিলেন।'[২৯] পরের বাক্যে কবির এ জীবনচেতনার স্বরূপ আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'এই কব্যচর্চার পটভূমি হিসেবে তিনি যথার্থভাবেই পেয়ে যান আধা ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী সমাজের অন্তর্ভুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল এমন একটি দেশে ও তার

দেশবাসীকে, যার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলমুক্তির জন্য প্রতিনিয়ত লিপ্ত হয়ে পড়ছিলেন নানা সংগ্রাম ও আন্দোলনে। তিনি তাঁর কবিতায় একাধারে উপজীব্য করে তুললেন দেশের সঙ্কট, শাসকশ্রেণীর দমনপ্রক্রিয়া এবং জনতার উজ্জীবনী ভাবনাকে।'[৩০] আর কারণেই নিজবাসভূমেই রাহমানকে দেখা যায় অধিকতর সামষ্টিক প্রয়োজনে আত্ম-বিবরমুখিতাকে ত্যাগ করে জনতার সঙ্ঘ-উচ্চারণে মিশে যেতে। ভাষা-আন্দোলনের চেতনাই তাঁকে এ বোধে সম্পৃক্ত করে—

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে কী থাকে আমার?
উনিশ শো' বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।[৩১]

আর কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে জীবনের অন্য মাত্রা যার সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নাড়ীর সংযোগ। আর আছে সাংগ্রামিক চারিত্র। কারণ কবির চতুষ্টয়ী জীবন-অন্বেষণে এও এক প্রান্ত—

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,[৩২]

সুতরাং জীবনের এ ঝাঁঝালো প্রান্তটিকে দেখা যাচ্ছে কবি স্পর্শ করছেন নবতর জীবনচেতনায়। সেখানে অপসৃত কবির পূর্বোক্ত নস্টালজিক চেতনার আত্মকথনের বর্ণনাময় মনোচিত্রভাষ। বরং এ পর্যায়ের জীবন-বীক্ষণের মধ্যে লক্ষ করা যায় ব্যঙ্গাত্মক মুড। রোমান্টিক চেতনার অনিবার্য অসহিষ্ণুতাই যেন উঠে এসেছে বর্ণনচিত্রে। এ পর্বে কবির বর্ণনারীতি একরৈখিক জীবনদ্রষ্টার মতো নয় বরং নগর-মনস্ক মধ্যবিত্তীয় মানসের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রে দিনাতিপাত ও প্রাপ্তির একঘেঁয়েমি প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনার বৃত্তাবদ্ধতায়—

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি;
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা

পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনে কথা শুনছি
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।[৩৩]

স্বাধিকার আন্দোলনে আলোড়িত হয়েছে রাহমানের কবিতা ; যার বীজ প্রোথিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের চেতনায়। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং যেন প্রার্থিত স্বাধীনতার অভাবে কবিকে আবারো কলম ধরতে হয়—

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডব দাহন?[৩৪]

বোঝা যাচ্ছে, কবির এ জীবনচেতনার একটি চলমান ও প্রাত্যহিক ভাষাবোধ শামসুর রাহমান আয়ত্ত করেছেন ইতোমধ্যে । এ চেতনা *নিজবাসভূমে (১৯৭০)* . *বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩)* প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপকতা পেয়েছে এবং শামসুর রাহমান হয়ে উঠেছেন আরো সাম্প্রতিক ও সমকালীন। তাই এ-কথা বলা যায় শামসুর রাহানের কবিতায় সমকালীন জাতীয়জীবন এক অনিবার্য সজ্ঘউচ্চারণ লাভ করেছে। কবির এ চেতনা স্বাধীনতা-উত্তরকালে কিছুটা শমিত হলেও আগ্রাসী রূপ লাভ করে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে (১৯৮৬), স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার (১৯৮৭), বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)* প্রভৃতি কাব্যে শামসুর রাহমান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম এই মূল্যবোধের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করে, স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতাপ দেখে কবিও আহত—

বিবরে লুকিয়েছিলো যারা গির্জার ইঁদুর হয়ে
ইদানীং তারা বনবেড়ালের রূপে
তুমুল ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তির চাতালে,
যখন তখন
বসায় নখর দাঁত জায়মান সৌন্দর্যের গোলাপী গ্রীবায়।

... ...

এই উল্টোরথ দেখে, শপথ তোমার
প্রেমের, আমার আজ বড় বেশি দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে।[৩৫]

আর এ সূত্রেই রাহমানের কবিতা হয়ে ওঠে অধিকতর জনতা-সংলগ্ন, বৃহত্তর গণমানুষের কণ্ঠস্বর। নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েই রাহমান নূর হোসেনের আত্মত্যাগের মহিমাকে রূপায়িত করেছেন সমষ্টির ব্যাপ্তির নৈর্ব্যক্তিক রূপ—

উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,

বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরের টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়[৩৬]

স্বৈরাচারী এরশাদ-বিরোধী চেতনায় সমকালীন স্বদেশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্ণনায় তাঁর ভাষাভঙ্গিতেও এসেছে ব্যঙ্গাত্মক মুড। আসলে রূপক-প্রতিরূপকের মাধ্যমে কবি এক গণতন্ত্রহীন, কণ্ঠরোধ সময়কে তুলে ধরেছেন নিচের কবিতায়। স্বৈরাচার ও তার দোসরদের বর্ণনায় রাহমান আশ্রয় নেন রূপকী ভাষার—

পুতুল খেলার ভারি শখ তাঁর
পেছন থেকে সুতো নেড়ে, সুতো ছেড়ে
তিনি হর-হামেশা নিজের মেজাজটাকে শরিফ রাখেন।
পুতুলগণ তাঁর চারপাশ
মুড়ে দিয়েছেন শুভেচ্ছা, অনলস খেদমত আর অন্তবিহীন
তোষামোদে। তাঁর শাসনামল, একজন
পুতুলের জবানিতে, একটি নিখাদ স্বর্ণযুগ।[৩৭]

শামসুর রাহমানের কবিতা বাংলাদেশের রাষ্ট্র-কাঠামোর বিবর্তনে এভাবেই এ ভূখণ্ডের মানুষের জীবন-কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিক স্মৃতিবর্ণনায় নিবিষ্ট কবি পরবর্তীকালে আমূল রূপান্তরিত হন সামষ্টিক মানুষের প্রাত্যহিক টানাপোড়নের রূপকার হিসেবে। আর তাঁর কবিতাও এ চতুরাঙ্গিক জীবন-প্রত্যয়ের মধ্যেই পেয়ে যায় এক সর্বৈব আবেদন। শামসুর রাহমানের কবিতা এ কারণেই প্রথম থেকে শেষাবধি এ জীবন-পরিক্রমা কবিচেতনার ইতিবাচক মর্যাদাপূর্ণ উত্তরণরূপেই পরগণিত হয়। এ ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান বাংলা কবিতায় একক, তুলনারহিত।

তথ্যপঞ্জি :

১. কাল সারারাত আমি কবিতার সঙ্গে অতিশয়
লত্‌কা লত্‌কি ক'রে কাটিয়ে দিয়েছি। বাতি জ্বেলে
দেখেছি উত্তুঙ্গ স্তন, নাভিমূল, শ্রোণী ; লজ্জা ফেলে
স্খলিত শাড়ির মতো কবিতা আমাকে, মনে হয়,
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ক'রে নিয়েছিলো কাল।
(কাল সারারাত, মাতাল ঋত্বিক, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২)

২. সেই ঘোড়াটা, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, ঢাকা, ১৯৬০
৩. রূপালি স্নান, প্রাগুক্ত
৪. তার শয্যার পাশে, প্রাগুক্ত
৫. সেই ঘোড়াটা, প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. দুঃখ, *রৌদ্র করোটিতে*, ঢাকা, ১৯৬৩
৮. আমার মা'কে, প্রাগুক্ত
৯. পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ, প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত
১১. *মাসুদুজ্জামান,বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ২৩৯
১২. প্রাগুক্ত
১৩. খেলনার দোকানে ভিখিরি, *রৌদ্রকরোটিতে*, ঢাকা, ১৯৬৩
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. জনৈক সহিসের ছেলে বলছে, *বিধ্বস্ত নীলিমা*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি, *নিরালোকে দিব্যরথ*, ঢাকা, ১৯৬৮
২০. প্রাগুক্ত
২১. বেগম আকতার কামাল, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ ৪২
২২. ইলেক্ট্রার গান, *ইকারুসের আকাশ*, সব্যসাচী, ঢাকা, ১৯৮২
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. ইকারুসের আকাশ, প্রাগুক্ত
২৫. চাঁদ সদাগর, *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*, ঢাকা, ১৯৮২
২৬. সাঈদ-উর রহমান,প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৭. দৈনিক আজাদ

২৮. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ১০৪

২৯. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, পৃ. ২৮০

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, *নিজবাসভূমে*, মাহতাবুন নেসা, ১৯৭০

৩২. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ , প্রাগুক্ত

৩৩. দুঃস্বপ্নে একদিন, প্রাগুক্ত

৩৪. তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, *বন্দী শিবির থেকে*, কলকাতা, ১৯৭২

৩৫. *দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে*, ঢাকা, ১৯৮৬

৩৬. *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, ঢাকা, ১৯৮৮

৩৭. কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না, প্রাগুক্ত